Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 178 – 182
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

‘দহন’ দর্পণে নারীর প্রতিবাদী প্রতিচ্ছবি

ইতিষা নন্দী
গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: itishanandi170@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
discrimination, unspeakable pain, diary, paw indecent, agreement, false ego, protest, communist.

Abstract

In a male-dominated society, discrimination between men and women is customary and resisted. Even though girls are half the sky, their role is limited to the unspeakable pain of domesticity and kitchen. And that is the diary of how many unknown tortures to hide the hidden words of a clear mind that goes on beyond the thick walls of Banedi house. In the seventies, Suchitra Bhattacharya came forward to write the words of those women in her ‘Dahan’. Here she portrays the highly educated and smart woman at the same time, as well as portraying the unheard subjugation of the housewives of the Banedi family hidden behind the banadiana. Here Jhinuk is one side and on the other side there is Ramita. To save this Ramita from the indecent clutches of four youths at the Tollygunge metro station, Jhinuk jumped on the miscreants. Not only that, the Jhinuk stood against all the family and society to get her justice on the social issue and dragged to the court. Even then, to protect the marital relationship with her husband Palash Ramita had signed an agreement not by the call of Jhinuk, but by Bonedibari. In a moment, the struggle and hard work of Jhinuk was broken. Ramita could not rely on his own backbone to come out of the darkness of the inner city and stand against the wrongdoers once and for all. Onthe other hand, Palash, who should have been by Ramita's side as her husband, forced Ramitato give false testimony to her in court, maintaining the false ego and nobility of male. Standing inthe 21st century from this point of view, Suchitra Bhattacharya throws some questions in our minds. Have we really been able to adapt this self-sentence of equal rights for men and women from our minds? May be not. So “Dahan” is not just the story of the personality development of a modern woman. Rather, it can be said that it is a mirror image of building a healthy communist society regardless of men and women by going against the prevailing norms.

Discussion

“স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া,
মেয়েদের স্বভাব;
দাসী হওয়া নয়।

...

স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তানের সেবা করে,
তার মধ্যে দায় নাই'।
প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে,
তার মধ্যে দায় নাই।।"

স্ত্রী, মা, মেয়ে হওয়া নারীর অদৃষ্ট তাদের ভবিতব্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করে রাখলেও এগুলো তাদের দায় নয়; তাদের স্বভাব। তাদেরই স্নেহ, ভালবাসা, প্রেমের প্রতিরূপ। মেয়েদের এই স্বাভাবিকতাকে যারা দুর্বলতা মনে ক'রে অন্দরমহলের অচলায়তনে বন্দী করতে চেয়েছিল তারাই সমাজের কাছে পরিচয় করিয়েছিল এক নতুন শব্দের; নারী বৈষম্যের। সেদিনের সেই পুরুষশাসিত সমাজ মেনে নিতে পারেনি যে, নারীরাও মানুষ। তাদেরও কিছু বলার আছে। শুধু জীবন রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে মেয়ে, স্ত্রী, মা-এর মতো একাধিক নাটকীয় চরিত্রের সংলাপ উদযাপন করাই তাদের একমাত্র কাজ নয়। সংসার করা, হেঁশেল সামলানো ও পুরুষের যৌন তৃষ্ণা মেটানোর বাইরেও তাদের অন্তরে থেকে যায় এমন অনেক অন্দরমহলের কথা যেগুলো হয়ত সমাজের দরবারে মুক্ত হবার আগেই সুপ্ত থেকে যায় পুরুষের চোখরাঙানিতে। কিন্তু এই লাল চোখের ইশারাকে উপেক্ষা করে সত্তর দশকের শেষ ভাগ থেকে যিনি নারীর কলমে নারীর কথাকে লিখতে এগিয়ে এলেন তিনি সুচিত্রা ভট্টাচার্য। তিনি শোনালেন নারীর যন্ত্রণা, সমস্যা ও তাদের নিজস্ব জগতের কথা। যেখানে আমরা কান পাতলেই শুনতে পাবো বনেদী বাড়ির মোটা দেওয়ালের ওপাড়ে চলতে থাকে মেয়েদের অধিকারকে শোষণ ও খর্ব করার কত অজানা অত্যাচারের দিনলিপি। সেই নির্যাতনকেই লেখিকে নাটকের গ্রীনরুম থেকে রঙ্গমঞ্চের ড্রয়িংরুমে এনে ফেলেছেন কখনও ঝিনুক, কখনও তিয়া, কখনও দোলা আবার কখনও অদিতি-র মতো নারী চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে। যারা স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করতে শিখল মেয়েদের ওপড় চাপিয়ে দেওয়া সামাজিক নিয়ম-নীতি,পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা ও নির্যাতনের প্রচেষ্টা তারা যুক্তির দাবীতে ও অধিকারের প্রশ্নে এক মূহূর্তে নিষ্ক্রিয় ও তুচ্ছ করে দিতে সক্ষম। তবে একথাও সত্য নারী মুক্তির এই স্পষ্ট স্বাদ কোন কোমল পথের মধ্যে দিয়ে আসেনি। এসেছে হাজার হাজার সত্যবতী, সুবর্ণলতা, সুহাসিনীদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি বার বার প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে সেটি হল– এত উপন্যাস ও নারী চরিত্র চিত্রনের মাধ্যমে ঔপন্যাসিকেরা যে সমাজে নারী অবস্থার পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কি আজও এই একবিংশ শতাব্দিতে পূরণ হয়েছে; না কি আজও তা প্রতিশ্রুতি হিসেবেই থেকে গেছে নানান প্রশ্নের ভিড়ে। এই সন্দেহেরই আমি যথার্থ উত্তর সন্ধান করতে প্রয়াসী হবো ঔপন্যাসিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাসে নারী মনস্তত্ত্বের পর্যালোচনায়।

আমরা দেখি সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর রচনায় উচ্চশিক্ষিত স্মার্ট নারী চিত্রনের পাশাপাশি তথাকথিত আধুনিকতার মোড়কে ঢাকা বনেদী পরিবারগুলির বনেদীয়ানাকেও সমানতালে পা মিলিয়েছেন। যার অন্তরালে নারী অধিকারকে খর্ব করার যে ধারাবাহিকতা আজও পরিবার তথা সমাজে বয়ে চলেছে তারই যথার্থ প্রতিচিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর রচনাসমূহে। তিনি দেখিয়েছেন নারীর বিবাহিত জীবন যেন এক দুঃস্বপ্ন। তারা কেবলই পুরুষের ভোগ্যবস্তু। যৌনজীবন ও জননী জীবনের প্রয়োজন যখন ফুরায় তখন মেয়েদের ঠাঁই হয় করুণা ও অবজ্ঞার নামান্তরে। পুরুষ প্রতাপের ছত্রছায়ায়, সমাজ নির্দ্দিষ্ট লিঙ্গ ভূমিকায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভীত যে দাঁড়িয়ে আছে কেবল একতরফা পুরুষের চোখরাঙানিতে সেই বয়ানরূপকে ভেঙে ফেলেই মেয়ের সাহসী কণ্ঠস্বরকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। তাই 'দহন' শুধু এক সাহসিকার কাহিনিমাত্র নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। ঝিনুক মস্তানদের হাত থেকে রমিতাকে বাঁচানোর পর কেবল থানা, পুলিশ, কোর্ট-কাছারি করেই সে রেহাই পায়নি। আসলে পুরুষ প্রধান সমাজে মেয়েদের ওপরে ঘটা জুলুমের দায়ভার হাস্যকরভাবে মেয়েদের ওপরেই বর্তায়। নারী স্বাধীনতা, নারীর মর্যাদা নিয়ে হাজার হাজার আন্দোলন হলেও সমাজ মেয়েদের ছেড়ে কথা বলে না। তার গায়ের দাগ যে এত সহজে ওঠে না। তাই মলেস্টেশনের শিকার হওয়া রমিতাকে শ্বশুরবাড়িতে এমনকি স্বামী পলাশের কাছেও মাথা নীচু করে প্রতিনিয়ত শুনতে হয়েছে অপমানের বন্যা। তখন তার মানসিক যন্ত্রণাও আশ্রয় পায়নি তার একান্ত আপন স্বামীর কাছেও। কারণ, পুরুষের করা অলিখিত নিয়মে মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক ধর্ষণের দাগের দায় নাকি পরে কেবল মেয়েদেরই ওপর; পুরুষ সেখানে কেবল নীরব দর্শক। তখন সেই মেয়ের যন্ত্রণাকে পাশে

সরিয়ে রেখে নেপথ্যে চলতে থাকে তার বিচার সভার আসর। সেই তর্ক-বিতর্কের আসরে সমাজ ভুলতে থাকে দেহের মৃত্যুর রেজিস্ট্রি করা হয়; আত্মার মৃত্যুর নয়। তাই রমিতাকে বলতে শুনি –

> "কিছুই যখন হয়নি, তবে কেন মা খালি বলছেন মেয়ে মানুষের গায়ে একটা দাগ পড়লেই মৃত্যু পর্যন্ত সে খুঁতো হয়ে যায়।"[১]

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা হল পরিবারের স্টেটাস সিম্বল। নারীরা সমাজের অর্ধেক আকাশ হলেও তাদের যৌন অধিকার তথা যৌন স্বাধীনতা আদৌ কতটা স্বীকৃত হয় তা এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন চিহ্নেই চোখ পড়ে। তাই যে পলাশের স্বামী হিসেবে এই সময়ে পরিবারের কাছে রমিতার সতীত্ব রক্ষা করা কর্তব্য হয়ে পড়ে সেই পলাশই নিজের পৌরুষের অহং প্রকাশ করতে স্বামী হয়েও রমিতাকে ধর্ষণ করতে পিছপা হয় না। তখন স্বামীর দাবিতে ধর্ষণের নামান্তর হয় অধিকারের জুলুমে। অপরাধের মাপকাঠি তখন আদালতের নেপথ্যে রমিতার নীরবতায় চোখ ভেজায়। অপরপক্ষে দৃঢ়চেতা, ব্যক্তিত্বময়ী ও প্রতিবাদী হওয়া সত্ত্বেও কোথাও যেন রমিতার দর্পণে দাঁড়িয়ে ঝিনুকও মুখ দেখে। তাই উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে দেখি গ্যাংটকের হোটেলে সম্ভোগোন্মত্ত স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে করতে ঝিনুক মনে মনে বলে –

> "এই দীর্ঘশ্বাস চেনে না পুরুষ। জানে না কত অভিমান অপমান যন্ত্রণা গোপন করে নারী ভালোবেসেছে তাকে। যুগযুগান্তর ধরে। পলাশ জানে না। তূণীরও জানবে না কোনদিন।"[২]

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন জাগে মনে – প্রতাপের প্রাণকেন্দ্রে পুরুষের অহং মেটানোর দায় কি কেবল মেয়েদেরই? আর নারীর আত্মসম্মান রক্ষা করার দায় কি কেবল পুরুষের মর্জিনির্ভর? তবে লেখিকা তাঁর উপন্যাসে শুধু রক্ষণশীল স্বার্থপর পুরুষের ছবি আঁকেননি; তাদের মানবিক মুখকেও অঙ্কন করেছেন। কোথাও কোথাও তিনি পুরুষকে নারীর প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে না দেখে তাদের হাতে মেয়েদের চোখের জল মুছিয়ে নারী মনের যত্ন করবার সঙ্গী হিসেবেও গড়ে তুলেছেন। শরৎ ঘোষাল চরিত্রটি যার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। যিনি পেশায় উকিল হওয়া সত্ত্বেও বৃদ্ধানিবাসের সেবায় প্রতিমূহূর্তে নিজেকে উজার করে দিয়েছেন। তাই তার কাছে মেয়েদের শারীরিক শূচিতার কোন দাম নেই। কারণ ছেলেরা নিজেদের দরকারে মেয়েদের শরীরের সম্মান বাড়ায় আবার নিজেদের দরকারেই তাকে বিবস্ত্র করে। তিনি বলেন –

> "সতীত্ব আর সততা একই শব্দের রকমফের। ওই টাকার দুটো পিঠের মতো। নিজের কাছে সৎ থাকাই সতীত্ব। সে ছেলেদের ক্ষেত্রেই হোক বা মেয়েদের ক্ষেত্রে।"[৩]

আসলে লেখিকার কাছে নারী স্বাধীনতা শব্দটি পিতৃতন্ত্রের মদতপুষ্ট কোন বিশেষ ছাড় নয়। এটি হল মনের এক বিশেষ অনুভূতি। যাকে অবলম্বন করে মেয়েরা জীবনের হাজার প্রতিবন্ধকতাকে একাই অতিক্রম করতে পারে। সেখানে প্রয়োজন নেই কোন পুরুষের দেওয়া সতীত্বের সার্টিফিকেটের; প্রয়োজন নেই কোন আদালতের আলাপচারিতার।

একবিংশ শতাব্দী দরুণ হয়তো সুচিত্রা ভট্টাচার্যের নারীরা অন্যের থেকে অনেক বেশি শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত। কিন্তু লিঙ্গ রাজনীতির যে চোরাস্রোত প্রতিনিয়ত পরিবার তথা সমাজে বয়ে চলেছে তার শিকার প্রত্যেকেই। সেখানে আশাপূর্ণার সত্যবতী বা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ঝিনুকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কোথাও যেন দুই প্রজন্মের লেখিকা মিলেমিশে এক হয়ে গেছেন। নারী স্ব-অধিকারের প্রশ্নে দুই প্রজন্মেই শোনা গেছে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে নারীর সঙ্গত কণ্ঠের সমবেত সুর। তাই 'দহন' শুধুমাত্র আধুনিক ব্যক্তিত্বময়ী নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের কাহিনি নয়; বরং বলা যেতে পারে আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া নারীর চিরন্তন বিশ্বাসের ভীতকে কিভাবে নাড়িয়ে দিয়ে এক জটিল জিজ্ঞাসার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সেই দর্পণের প্রতিচ্ছবি। তাই এই উপন্যাসটি কোন শ্রবণা বা ঝিনুক নামের কোন নির্দিষ্ট এক বীরাঙ্গনার কাহিনি নয়। টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের চত্বরে চারজন যুবকের অশ্লীল থাবা থেকে এক বনেদী বাড়ির গৃহবধূ রমিতাকে বাঁচাতে যে মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুষ্কৃতিদের উপর; তার প্রতি হওয়া অন্যায়ের বিচার চাইতে নির্দ্বিধায় যে মেয়েটি রেশ টেনে নিয়ে গিয়েছিল আদালতের কাঠগোড়া পর্যন্ত; সেই ঝিনুকই একদিন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে প্রত্যেকের প্রতিদিনের খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হাজার ঘটনার ভিড়ে তার এই সাহসিকতা ও অভিনন্দনের হেডলাইন কিভাবে যেন একদিন আবছা হতে থাকে। কত সামাজিক তথা পারিবারিক চাপ ঘুণপোকার মতো নষ্ট করে দিতে থাকে নারীর প্রতিবাদ এমনকি লাঞ্ছনাকেও। সময়ও এক সময় সময় নিয়ে ঝিনুককে বোঝাতে শুরু করে তুমি মেয়ে হয়েও তোমাকে লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে; পুরুষের সমান চাকরি করবার স্বাধীনতা

দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তুমি কখনই পুরুষ মানুষের সমান হতে পারবে না। তোমার চারিদিকে কেটে দেওয়া এক্তিয়ারের বাইরে বেরিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করবার অধিকার তোমার নেই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ঠিক যতটুকু ছাড় তোমার জন্য বরাদ্দ রেখেছে ঠিক ততটুকুই তোমার প্রাপ্য। কিন্তু ঝিনুকের ভিতরে ছাই চাপা আগুন যে এই ব্যবস্থাপনাকে মানতে রাজি হয়নি কোনদিন। অন্যায় দাবির বিনিময়ে নারীর ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জঘন্য কৌশল ঝিনুককে নড়াতে পারেনি এক মূহুর্ত। তাই ঝিনুকের কাছে রমিতা চৌধুরীর কেসটি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে ছাপিয়ে হয়ে ওঠে এক মৌলিক প্রশ্নে। কোন পুরুষের চোখে নয়; একজন নারী হয়ে সামাজিক পরিবেশে নারীর বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার অধিকার আছে কি নেই, সেটা জানার প্রশ্নে। সেখানে নিজের ভালবাসাকেও টিকিয়ে রাখতে গিয়ে কোন অলিখিত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেনি ঝিনুক। তাই সে অবলীলায় জানিয়েছে –

> "কে বলেছে সে পুরুষ মানুষের সমান হতে চায়? কখখনো না। সে একটা মানুষ হতে চায়। পুরো মানুষ।"[৪]

অন্যদিকে একই সময়ে দাঁড়িয়ে রমিতা শিক্ষিতা, সুন্দরী ও আধুনিক রুচিসম্পন্ন মেয়ের সার্টিফিকেটে পাশ করে বনেদী বাড়ির গৃহবধূ হয়ে পরিবারের প্রেস্টিজ সিম্বল রক্ষা করবার দায়িত্ব পালন করে যায় দিনের পর দিন প্রতিমুহূর্তে। তবুও সেই রমিতাই যখন মলেস্টেশনের শিকার হয়, তখন ন্যায্য বিচারের প্রশ্নে স্বামী পলাশ পাশে না থেকে বুঝিয়ে দেয় প্রিয়তমা ঘরণী হয়ে থাকতে হলে তাকে অর্পণ করতে হবে নমনীয় দাস্য। তবেই নাকি অটুট থাকবে রমিতা–পলাশের বিবাহ বন্ধন। যে রমিতা পলাশের সাথে বিবাহ বন্ধনের পর নিজের কাছে তারপর প্রশ্নে একটাই উত্তর দিয়েছে তারপর তারা আর পর হবে না কোনদিন; সেই রমিতাই স্বামী-স্ত্রীর চুক্তিপত্র দেখে মোক্ষম সময়ে তার মুখে শব্দেরা আর ধরা দিতে চায়না। তাই এই রমিতা ঝিনুকের আপ্রাণ প্রয়াসে ন্যায় বিচারের দোরগোড়ায় পৌঁছেও দ্বন্দ্বে পড়ে যায় দুই প্রশ্নের। একদিকে ঝিনুকের প্রচেষ্টায় তার শ্লীলতাহানীর সার্বিক প্রতিবাদ; অন্যদিকে বিবাহ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পলাশের বয়ানে স্বাক্ষর করার অন্তর পিয়াস। এই দুই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত রমিতা সার্বিককে বাদ দিয়ে অন্তরকেই কাছে টেনে নেয়। হয়তো আবারও ঘোমটা পরে পলাশের হাত ধরে সে চলে যায় বনেদী বাড়ির নিয়মমাফিক খুঁটিনাটি কাজ সামলাতে। তবুও নিজের কাছে মেরুদণ্ডের প্রশ্নে সেদিন আদালতে দাঁড়িয়ে তার গর্ভে থাকা পলাশের ভালবাসাহীন অনিচ্ছার সন্তান তাকে একবার হলেও নাড়া দিয়েছিল, সাহস জুগিয়েছিল শেখানো বুলির বাইরে নিজের কথাকে নিজের মতো করে বলতে। হয়তো সেও সেই মুহূর্তে মায়ের কণ্ঠে শুনতে চেয়েছিল তার আগমনের নেপথ্যে পুরুষের অন্যায় আবদারের তীব্র প্রতিবাদ করুক মা। তাই রমিতার মনে হয় -

> "সে রাত্রে কি ভালোবাসার অস্তিত্ব ছিল কোথাও? সন্তান আসছে নেহাতই জৈবিক নিয়মে। রমিতার ইচ্ছা অনিচ্ছা, ভালোলাগার তোয়াক্কা না করে। ...গর্ভের সেই শিশুটা কি নড়ে উঠল! সে কি অন্য কিছু শুনতে চায়!"[৫]

আমাদের সমাজ যে ফিলোজফিকে আশ্রয় করে আবর্তিত হয় তা হল একদিকে ক্ষমতাবানের সর্বপ্রকার ভোগাধিকারের সংরক্ষণ অন্যদিকে ক্ষমতাহীনের সর্বাধিক মানবাধিকারের প্রত্যাখান। কিন্তু সমাজে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকারের লড়াই কখন থামিয়ে রাখা যায় না। তা যে প্রতিহত, প্রবাহিত তা বুঝিয়ে দিয়েছেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর লেখনী সত্ত্বায় এই একবিংশ শতাব্দিতে দাঁড়িয়ে আমাদের মনকে তার ব্যস্ততার মাঝে একটু অবসর নিয়ে ভাবতে বলেছেন – মানুষ আজ সর্বোত্তম জীবে রূপান্তরিত হলেও মানসিকভাবে সত্যিই কি আমরা আধুনিক মনস্ক হয়ে উঠতে পেরেছি? ক্রমশ বিত্তশালী জীবন-যাপনের উচ্চাকাঙ্খায় সত্যিই কি মানুষের মানবিক বোধ আজ নিঃশেষিত? নর-নারীর সমান অধিকার – এই আপ্তবাক্যটিকে কি সত্যিই আমরা মন থেকে শিলমোহর দিতে পেরেছি? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে একই সময়পর্বে একই কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে রমিতা ও ঝিনুককে দুটো আলাদা পথে হাঁটতে হল কেন? আসলে মেয়েরা যেন কোথাও নিজেরাই নিজেদের পরিচিত খাঁচায় থাকাকে অভ্যাস করে ফেলেছে। নিজেদের সীমাবদ্ধ স্বাধীনতাকেই একমাত্র লক্ষ্যবস্তু ভেবে এগিয়ে চলেছে। আর তাতেই নারীর তুচ্ছ সংস্কার, ভয় ও লজ্জার কারণে প্রতিমুহূর্তে নারী কোথাও অপর নারীকে অবদমিত করছে আবার কথাও বা নিজে অবমানিত হচ্ছে। আর এই কারণেই সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর কলমের ধারে অন্তঃপুরচারিণীদের হলদে হেঁশেলের অব্যক্ত যন্ত্রণার পাশাপাশি চাকুরিজীবী নারী জীবনের বিশ্বাসহীন ভঙ্গুর সম্পর্কের মানসিক যন্ত্রণাকে একই ক্যানভাসে উপস্থাপন করেছেন তাঁর 'দহন' উপন্যাসে। তিনি সাহস জুগিয়েছেন স্বপ্ন দেখতে; মুখে বুলি ফুটিয়েছেন – ভাঙুক না সময়ের টানে নিয়মের পাড়, বাঁক বদল হোক না নারী-পুরুষের চিরাচরিত সম্পর্কের; তবুও আবহমান চোরাস্রোতের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 178 - 182
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নানান ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সাথে নিয়েই গড়ে উঠুক না নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এক সাম্যবাদী সুস্থ সমাজের অঙ্গীকার। যাতে এমন অনেক সত্যবতী, অনেক রমিতা, অনেক ঝিনুকরা ছড়িয়ে দিতে পারে এক যুগের থেকে আর এক যুগের, পুরাতনের থেকে নবীনের কাছে এমন বার্তা –

"আমরা চালাই ঘর সংসার বাজার
আমরাই বুনি নকশিকাঁথার পাড়
... আজ আমাদের সমানাধিকার পালা
আমরা গড়ব আমাদের সংসার
ভালবাসা দিয়ে শাসন করব আর
মাথা নোয়াব না কারও কাছে বারবার।"

Reference:

১. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, দহন, পৃ. ৪৫
২. তদেব, পৃ. ১৭৪
৩. তদেব, পৃ. ৬২
৪. তদেব, পৃ. ৮৮
৫. তদেব, পৃ. ১৫১

Bibliography:

চক্রবর্তী, সুমিতা, উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮
দাস, উদয়চাঁদ, আখ্যানের সম্প্রসারণ (উনিশ শতক - বিশ শতক), প্রথম সংস্করণ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রাজবাটি, ২০০৯
বসু, রাজশ্রী, নারীবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৪
বসু, রাজশ্রী ও চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পা.), প্রসঙ্গঃ মানবীবিদ্যা, উর্বী, কলকাতা, ২০০৫
ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, দহন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১১
মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, ১৪১৭

সাময়িক পত্র-পত্রিকা :

'লেখিকাদের লেখালেখি, কোরক, বইমেলা সংখ্যা, ২০১৭